Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 37-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রথম প্রতিশ্রুতি : এক প্রতিবাদী নারীকণ্ঠ

ড. উত্তম পালুয়া
সহকারী অধ্যাপক, গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, আসাম

Abstract

In the present world feminism is an important issue. Women are progressively going forward though in slow pace. Rejecting the patriarchai hierarchy women have today formed a totally their own world. This mission of women liberation or women awakening is not formed so easily. Behind this there is a long history of contribution of strugging people. On the one hand there was western education and culture, on the other hand the struggle of self-establishment and self-dignity of women started in this country through the efforts of some renaissance awakened people. The evolution of this finds expression in different branches of culture and art. Rammohan, Vidyasagar, Madhusudan, Rabindranath, Sarat Chanda placed women on dignified position. Later on so many great ones came forward with some mission. But in the last phase of twentieth century a galaxy of women writers appeared in the Bengali literary arena, who changed the feminist idea from their different outlooks. Of them most important one was Ashapurna Devi. Many were vocal about plight of women before and after her. But Ashapurna Devi first told the pangs and plight of women life caged in patriarchal boundary. At the same time she widened the path of their of women life caged in patriarchal boundary. At the same time she widened the path of their continual liberation. In this respect her timeless trilogy pratham protishruti, Subarnalata, and Bakulkatha are noted. She beautifully delineated the picture of social position of women and their continual liberation through the three characters-Sartyabarti, Subarna and Bakul of her trilogy. The women voice we heard in protesting satyabati burst in through Bakul. Thus Ashapurna Devi's trilogy gained momentous as craftsmanship, it is a marvelous socio historical document as an exceptional characteristic presentation of the time . The aim of my discussed paper is to present this special lesion of feminism.

" আমার কবিতা আলোর চাতক, অন্ধকারের মুনিয়া
কবিতা আমার ঘরের যুদ্ধ, যুদ্ধশেষের কান্না
আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ
আমার কবিতা পোড়া ইরাকের ধ্বংসে রক্ত গোলাপ
আমার কবিতা ফুটপাত-শিশু, গর্ভে নিহত কন্যা
কবিতা আমার ঝড় দুর্যোগ মহামারি ধ্বস বন্যা
আমার কবিতা বাঁচতে শিখেছে নিজেই নিজের শর্তে
সেলাম সেলাম জিঙ- কাটা খনা, ব্যাস, বাল্মীকি, দান্তে
আমার কবিতা আগুনের খোঁজে বেরিয়েছে কাঠ আনতে। " [১]

ঋক্‌বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আবহমানকাল ধরে বয়ে চলা নারীলাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী বর্ণমালা গড়ে তুলেছেন এযুগের অগ্নিকন্যা মল্লিকা সেনগুপ্ত। খনা- দ্রৌপদীর উত্তর-কন্যা মল্লিকা তাঁর কবিতার বয়ানে যেকথা বলেছেন, সেই একই কথা আমাদের শুনিয়েছেন 'ইতিহাসে-স্ত্রী পর্ব'- এর স্রষ্টা জ্যোতির্ময়ী দেবী। নারীদের অনন্ত দুর্দশা ও লাঞ্ছনার কথা ভেবে তিনি বেদনার পীড়িত হয়েছেন। সেই পুরাকাল থেকে; সীতা সতী, আম্বা, দ্রৌপদী, বেদবতীর আমল থেকে একালের সুতারা পর্যন্ত- শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমানভাবে চলেছে নারীলাঞ্ছনাপর্ব। এর বিরাম ঘটেনি আজও। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লেখিকা জানিয়েছেন –" চিরকাল এই চললো। চলবেও বুঝি অনন্তকাল ধরে। পুরুষের কাপুরুষ বর্বরতা। পশুরাও যা করে না।"[২]

নারীদের এই চরম লাঞ্চনা অপমানের পরম বেদনার ইতিহাস কোথাও নেই এবং আজও তা লেখা হয়নি বলে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন লেখিক। তবে একথা ঠিক, অত্যন্ত ধীরলয়ে হলেও উনিশ শতকের পর থেকে এদেশে বিকাশ ঘটেছে নারীচেতনারো। পাশ্চাত্য শিক্ষা- সংস্কৃতি তথা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে সুপ্ত বাঙালি জাতির নিদ্রাভঙ্গ ঘটে। নবজাগরণের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত কিছু মানুষ নব্য মানবাবাদ, সংস্কার মুক্ত চেতনা এবং নতুন মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও ও বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে নবজাগরণের জোয়ার আসে। এদেশের শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং মানুষের মূল্যবোধে একটা আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেয়। মানুষ যে সংস্কার ও বিধি- বিধানের চাইতে অনেক বড় সেকথা অনুভব করলেন জাগ্রত চেতনার মানুষেরা। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শুরু হল নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল বাংলা সাহিত্যে নানাভাবে। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে শোনা গেল নারীমুক্তির সুর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতার নারীর কণ্ঠে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ঘোষণা করলেন অত্যন্ত জোরালোভাবে। নজরুল ইসলামও পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরব হলেন । শরৎ- সাহিত্যে নারী স্বতন্ত্র মূল্য পেল নারীদের স্বতন্ত্র পরিসর গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরবর্তীকালে এগিয়ে এলেন আরো অনেকেই। বিশ শতকের শেষ পর্বে আবির্ভূত হলেন একঝাঁক মহিলা সাহিত্যিক যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-
জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সুলেখা সান্যাল, মল্লিকা সেনগুপ্ত, দেবারতি মিত্র, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, সংযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী বসু, সুতপা সেনগুপ্ত, সুচিত্রা ভট্টাচার্য , তসলিমা নাসরিন প্রমুখ । এতদিন পুরুষের কলমে ব্যক্ত হয়েছে ফেমিনিস্ট ধারণা- এবার শুরু হল নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীজীবনের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভব তুলে ধরবার নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নতুন ভাবনা-চিন্তা। নারীদের অকথিত ইতিহাস রচিত হল এঁদের হাতে। সূচিত হল সাহিত্যের এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়। যাকে 'নারীচেতনা বাদী পাঠ' বলে অভিহিত করা চলে ।

ইতিহাসের পিতৃতান্ত্রিক নির্মিতিকে তীব্র ভাবে প্রত্যাখ্যান করে নারীদের চরম লাঞ্ছনা আর পরম বেদনার ইতিবৃত্ত রচনা করতে যিনি লেখনীকে অস্ত্ররূপে ধারণ করেছিলেন তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তাঁর আগে ও পরে অনেকেই নারীজীবনের নানা কথা আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের অচলায়তনে গৃহবন্দিনী অন্তঃপুরচারী নারীদের জীবনকথা সেভাবে আর কেউই তুলে ধরেননি। নারীদের চরম লাঞ্চনা আর পরম বেদনার ইতিহাস আশাপূর্ণা তাঁর রচনায় যতটা মর্মস্পর্শীভাবে অঙ্কন করেছেন তা তাঁর সমসাময়িককালে এমনকি আজ পর্যন্ত কোনো সাহিত্যিকের রচনায় সেভাবে ফুটে ওঠেনি। লেখিকা নিজে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে এবং রক্ষণশীল পরিবারের বউ হওয়ায় নিজের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন খাঁচারুদ্ধ নারীদের জীবনযন্ত্রণা। তাঁর সেই চোখে দেখা, গন্ডিবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত অন্তেবাসী নারীদের তীব্র নিরুপায় আর অব্যক্ত রোদন কথা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তিনি বস্তুতই যে নারিদের কথা কেউ কখনো বলেনি, সেইসব অনামী মেয়েদের অকথিত ও অনালোকিত ইতিহাস আর অকর্ষিত জগতকে পাঠকৃতির প্রধান আধেয় করে তুলেছেন আশাপূর্ণা দেবী । এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি-

> *" প্রথম জীবনে মেয়েদের অবরোধ সমস্যাই আমাকে সবচেয়ে বেশী পীড়িত করত । ছেলেবেলা থেকেই তো দেখেছি সেই বন্ধন দশাগ্রস্ত অবস্থা । সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষের প্রবল প্রতাপ । মেয়েদের খুব নতজানু হয়ে থাকতে হত ।।.. অল্পবয়সী মেয়েদের বিশেষ করে বৌদের জীবন ছিল দুঃখের নিরুপায়ের, সেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করতো, কেন এমন আবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা ? লেখার মধ্যে সেই প্রশ্নই দেখা দিয়েছে বারে বারে । "*[৩]

আশাপূর্ণা তাঁর দীর্ঘায়ু জীবনে লিখেছেন প্রচুর মোট ২৫০ টি উপন্যাস; ৬৭টি ছোটগল্পের বই- যেখানে ছরিয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রায় ৩০০০টি ছোটগল্প । এছাড়া শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন ৬২ টি গল্প উপন্যাস। ধর্মবিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধও রয়েছে...। সবমিলে তাঁর সৃষ্টির জগৎ বিশাল। এই বিপুল সাহিত্য সম্ভাবের মধ্য থেকে আমাদের আলোচ্য কেবলমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ত্রয়ী উপন্যাস- 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৮), ' সুবর্ণলতা' (১৯৬৭) ও 'বকুলকথা' (১৯৭৪) নিয়ে। লাঞ্ছিতা নারীর আত্মকথা এই তিনটি উপন্যাসেরই মূল উপজীব্য। প্রথমটিতে যেকথা বলা হয়েছে সেই একই কথা বয়ে গেছে পরবর্তী দু'টি উপন্যাসে। তাই একত্রে এদের বলা হয় ট্রিলজি। এই ত্রয়ী উপন্যাসের তিনি নারী যথাক্রমে সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের মধ্য দিয়ে তিনটি যুগকে লেখিকা ধরতে চেয়েছেন। অতীত, বর্তমান ও আসন্ন ভবিষ্যত- এই ত্রিকালের তিনজন নারিকে প্রতিনিধি করে তিন যুগের নারীজীবনের ব্যর্থতা, অসহায়তা, লাঞ্ছনা, অপমান, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও নারী থেকে মানবী হয়ে ওঠার চন্ড অভিজ্ঞতা লেখিকা তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, আশাপূর্ণার ট্রিলজি কেবল উপন্যাস শিল্পমাত্র নয়, একটি ব্যতিক্রমী যুগবৈশিষ্ট্যে উপস্থাপক। সমাজ ইতিহাসের এ এক অসামান্য দলিল। ত্রয়ী উপন্যাসের এই গুরুত্বের কথা লেখিকা স্বয়ং করেছেন-

> *" বাইরে জগতের যত কিছু ভাঙা- গড়া, যুদ্ধ, বিদ্রোহ, রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এ সবের হিসেব লিখে রাখেন ইতিহাসকার। কিন্তু সে ইতিহাস অন্তঃপুরের কথা বলে না, হিসেব রাখে না তার ভাঙাগড়ার। অথচ সেখানেও চলে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, মুক্তি, তপস্যা। এই ত্রয়ী সেই যুদ্ধ আর তপস্যার ইতিহাস ।"*[৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেকখানি সময় জুড়ে আছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের কালপর্ব। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতীর অর্ধেক জীবন কেটেছে নিত্যানন্দপুর আর বারুই পুরে। বাকি অর্ধেক জীবনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে শহর কলকাতা যার কালসীমা উনিশ শতকের শেষার্ধ। নায়িকা সত্যবতী সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন 'সত্যবতী প্রতিবাদের প্রতীক।' [৫] আশৈশব সঞ্চিত যাবতীয় ক্ষোভ, দুঃখ জ্বালা এবং প্রতিবাদ লেখিকা সত্যবতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে লেখিকা অসংখ্য নারীর লাঞ্ছনাময় জীবনের করুণ বৃত্তান্ত আমাদের শুনিয়েছেন; তবে তাঁর মূল লক্ষ্য সত্যবতী। সত্যবতীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখিকা সেযুগে নারীদের প্রকৃত অবস্থান বর্ণনা করেছেন। সত্যবতী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পুরুষলাঞ্ছিত স্ত্রীপর্বের বর্বর রূপটি। কন্যা –জায়া- জননী তিনরূপেই সত্যবতীকে আমরা সময়ের প্রেক্ষিতে অগ্রবর্ত্তিনী নারী হিসেবে দেখি। সত্যবতী চেয়েছে নারীর স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশ। কিন্তু কুসংস্কারচ্ছন্ন প্রাচীন ধ্যানধারণায় আত্মস্থ গ্রামবাংলায় নারীর স্বাভাবিক বিকাশ পদে পদে বাধা পেয়েছে। সতীত্ব- সংস্কারের শেকলে পিতৃতন্ত্র নারির শরীর- মন –আত্মা এবং ভূত- ভবিষ্যত- বর্তমানকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে। খাঁচায় রুদ্ধ পাখির মতো। মুক্তির জন্য ছটফট করেছে, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়েছে তার। ক্রমশ বঞ্চিত হতে হতে পিছিয়ে পড়েছে নারীসমাজ। সত্যবতী এই বঞ্চিত –লাঞ্ছিতা নারীসমাজের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ করেছে প্রচলিত বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে। গ্রাম বাংলা একান্নবর্তী পরিবারে সত্যবতীর বেড়ে ওঠা। বড় পরিবারের নানা আচার- বিচার, বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস তার চোখে ছেলেবেলা থেকেই ধরা পড়েছে। নিজের সহজাত বোধ- বুদ্ধি দিয়ে সে বিচার করেছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে যা কিছু তার যুক্তিতে বেমানান বলে মনে হয়েছে নিজের সাধ্যমতো প্রতিবাদ করেছে । সত্যর ছিপ দিয়ে মাছধরা নিয়ে দীনতারিণী এবং মোক্ষদা যখন চোখ কপালে তুলেছেন, তখন সে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলেছে –

" আহা! ছোটঠাকুমার কী বাক্যির ছিরি! মেয়ে
মানুষ মাছ ধরে না ? রাঙা খুড়ীমারা ধরে
না ? ও পড়ির পিসিরা ধরে না ?.... গামছা
দিয়ে ধরলে দোষ ? চুনোপুটি ধরলে দোষ হয়
না, বড় মাছ ধরলেই দোষ ? তোমাদের
এইসব দোষের শাস্তর কে লিখেছে গা ? "[৬]

এভাবে সত্যবতী সমাজ প্রচলিত শাস্ত্রের মূলে আঘাত হেনেছে । উপন্যাসের মধ্যে দেখি মাত্র নয় বছরের সত্যবতী খেলার সাথীকে বলেছে –

" মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের
পেটে জন্মায় না বানের জলে ভেসে আসে।"[৭]

সত্যবতী এই উক্তির মধ্য দিয়ে মেয়ে মানুষের প্রতি সমাজের অবজ্ঞা ও প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ।

সত্যবতী সময়ের প্রেক্ষিত অনেক এগিয়ে। একটি নারীর যা হওয়া উচিত, সেই সময় তা হয়ে উঠতে না পারার যন্ত্রণা-বেদনা সব নারি উপলব্ধি না করলেও অনেক করেছে, সত্যবতী তাদেরই একজন। সত্যবতীকে আত্মপ্রতিষ্টার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তার পিতা রামকালী চট্টোপাধ্যায় যিনি 'নাড়িটেপা বামুন' বলে পরিচিত। রামকালীই মেয়ের হাতে কালি-কলম তুলে দিয়েছেন। মেয়ের লেখা-পড়ার অগ্রগতির খবর নিতে গিয়ে রামকালী যখন মেয়েকে বলেন - "তা মেয়েমানুষের এত বেদপুরাণ জানবার দরকারই বা কি?"[৮] তখন সত্যবতী পিতাকে তীব্র ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ করে জবার হৃদয়-

" এত যদি না দরকারের কথা তো মেয়ে মানুষের জন্মাবারই
বা দরকার কি, তাই বল তো বাবা শুনি একবার?"[৯]

এমন দুঃসাহসিক উত্তর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এর পূর্বে কখনো শোনেনি । দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতার কাছে সত্যবতীর এই যে জিজ্ঞাসা এ আসলে সমগ্র পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেই লাঞ্ছিতা নারীর তীব্র জেহাদ ঘোষণা ।

ছেলে আর মেয়ে এই লৈঙ্গিক- বৈষম্য চিরকাল ধরে আশাপূর্ণা দেবীকে পীড়িত করেছে । একমাত্র মেয়ে হয়ে জন্মাবার জন্যই তাঁর পরিবার লেখিকাকে স্কুল- কলেজ পড়তে দেয়ন। এই দুঃখ গভীরভাবে তাকে পীড়া দিয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই গোঁড়ামির প্রতি আঘাত হেনেছে সত্যবতী। পড়াশোনায় যে মেয়েদেরও অধিকার আছে সেকথা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে ।

" বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয় ? সকল শাস্তরের
সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না ?"[১০]

এত বড় স্পষ্ট সত্য কথা সত্যবতী আগে কেউ কখনো উচ্চারণ করেনি। সমাজের যাবতীয় বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, যাবতীয় 'শাস্তর' যে 'ব্যাটাছেলাই ছিষ্টি' করেছে একথা সত্যবর্তী নির্ভীক কণ্ঠেই ঘোষণা করেছে ।

উনিশ শতকের বাংলা সমাজেও কৌলিন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এগুলোকে হাতিয়ার করে পুরুষেরা নিজের স্বার্থে বা প্রয়োজনে নারীর উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতো । পুতুল খেলার বয়সী মেয়েরা 'নাকে নোলক, কানে মাকড়ি, পায়ে মল,' ঘোমটা দেওয়া শাড়ি পরে যাত্রা করতো শ্বশুরবাড়ি নামক মৃত্যুপুরীতে । সেখানে সারাজীবন ধরে তিলে তিলে যন্ত্রণাভোগ করার পর একদিন ঢলে পড়তো মৃত্যুর কোলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে এই একই রীতির পুনারাবৃত্তি। উপন্যাসের নায়িকা সত্যবতী এবং তার কন্যা সুবর্ণ- বাল্যবিবাহের শিকার দু'জনেই। দু'জনেই চেয়েছে নারীর স্বাভাবিক বিকাশ, নারীজীবনের স্বাধীনতা। কিন্তু দু'জনের জীবনই ব্যর্থ হয়েছে । একজন হার মেনে বিদায় নিয়েছে বিরূপ পৃথিবী থেকে; অন্যজন বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের খোঁজে ঘর ও বর ছেড়েছে । সত্যবতী রামকালীর একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৮ বছর বয়সে তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে । গোত্রান্তরিত হয়ে বারো বছর বয়স হতে না হতেই পিতৃগৃহের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে তাকে চলে আসতে হয়েছে বারুইপুরে শ্বশুরগৃহে- তারপর নিরন্তর- নিঃসীম দহন। শাশুড়ি এলোকেশীর যন্ত্রণা, স্বামীর ঔদাসীন্য, পাড়া- পড়শির ব্যঙ্গ -বিদ্রুপ সবকিছুই সত্যবতী নীরবে সহ্য করেছে । কিন্তু যখন তার নারীত্বে যা লেখেছে তখনই সে বাঘিনীর মতো গর্জে উঠেছে । চুল বেঁধে দেওয়ার আছিলায় এলোকেশী সত্যর পিঠে কিল বসালে বজ্রনির্ঘোষে সে তার প্রতিবাদ জানিয়ে বলে -

" তুমি আমায় মারলে যে ।।... আমি অমন ছোটলোকে নই ।
তবে মনে রেখো আর কোনদিন যেন-" [১১]

শাশুড়ির মুখোমুখি অগ্নিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে তার তুলের প্রতিবাদ করার এই দুঃসাহস সেকালে খুব কম গৃহবধূরই ছিল। সত্যবতী সেই দুঃসাহসের প্রতিমূর্তি। অন্যায়কে যে মুখ বুজে সহ্য করেনি, মেনে নেয়নি মাথা পেত। আর নেয়নি বলেই শ্বশুর নীকাম্বরের প্রতি রাতে লুকিয়ে বাগদী বাড়ি যাওয়ার ঘটনার সে তীব্র প্রতিবাদ করে। যাকে সত্য এতকাল 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন জানিয়ে এসেছে, যাকে বিনীত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেছে তার এই অচিন্ত্যনীয় নীচতা, ক্ষুদ্রতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সে। সংস্কারে এসে অনেক হৃদয়হীনতা দেখেছে সত্য, সহ্য করেছে এদের অশিক্ষা কুশিক্ষার যন্ত্রণা। কিন্তু পিতৃতুল্য লোকের চরিত্রহীনতার নোংরামি তাকে দারুণভাবে আঘাত হেনেছে । তাই তার অটল সিদ্ধান্ত-

" না না এ শ্বশুরকে সে ভক্তি ছেদ্দা করতে পারবে না ,

তাতে সত্যকে যে যাই বলুক ।.... 'আস্ত' তাকে না
থাকতে হয় তাও ভাল, তবু ওই অপরিত্র মানুষটার পায়ের
ধুলো মাথায় নেবে না সে।" [১২]

শুধু এতেই থেমে থাকেনি সত্য, শশ্বর কে ইতরজনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছি- " এক হিসেবে উনি পতিত। শালগেরামের পুজো ওর দ্বারা হওয়া উচিত নয়।" [১৩]

বিশ্বভুবনে এযাবৎ যে কথা কেউ কখনো বলেনি, শোনেনি, ভাবেনি - সেকথা আমাদের শুনিয়েছে সত্যবতী। পুরুষতন্ত্রের বেপরোয়া মূর্তি ও প্রতাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এই দুঃসাহস সেকালে খুব কম নারীই দেখিয়েছে। আর যে দু'একজন দেখিয়েছে তাদের হাত ধরেই নির্মিত হয়েছে ভবিষ্যতকালের রাস্তা। সত্যবতী আমাদের প্রথম যুগের পথ নির্মাতা। অন্তঃপুরে গৃহবন্দিনী নারীদের মুক্তিকামী সত্ত্বার প্রতীক ।

"প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের নারী লাঞ্ছনার সকরুণ দৃশ্যটি উন্মোচিত হয়েছে কাহিনির একদম শেষদিকে। সত্যবতীর দীর্ঘ দিনের সাধনা ও সংগ্রামকে চূর্ণ করে দিয়ে তার অপদার্থ স্বামী ও ঈর্ষা- কুটিলা শাশুড়ি যখন তার আট বছরের শিশুকন্যা সুবর্ণকে বিয়ে দিয়ে দেয় তখন সত্যবতী উপলব্ধি করে নারীজীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস ও চরম অসহায়তা। সত্যবতী এতকাল স্বপ্ন দেখেছিল স্বামী-সন্তান সহ এক সুস্থ স্বাভাবিক সংসার জীবনের । সেই লক্ষ্যেই গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার বাসা বাড়িতে এসে উঠেছিল সে। ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে সুনাগরিক ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন ছিল তার। নিজেও বিদ্যাচর্চা করেছে । ইংরাজি শিখেছে । কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে গেছে। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য পেয়েছে। স্কুলে মহিলাদের পড়িয়েছে । কিন্তু এতসব করেও তার সাধনা পূর্ণতা পেল না - পেল না আশার আলো। অন্ধকারের করাল গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষা করতে পারলা না সত্য। তার অজান্তেই স্বামী নবকুমার ও শাশুড়ি এলোকেশী সুবর্ণের বিয়ে দিয়ে সত্যর উপর প্রতিশোধ নিল। এই 'পুতুল খেলার বিয়েটা ' কিছুতেই মানতে পারেনি সত্য । তাই স্বামী- সংস্কার ছেড়ে মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছে সে 'স্বামীর অন্ন ত্যাগ দিয়ে চলে যাবার' এই দুঃসাহস দেখে অকাতরে গালি বর্ষণ করতে থাকে নবকুমার। কিন্তু সত্যবতীর মানসিক বিচলন ঘটে না তাতে । বরং স্বামীর তীব্র কটাক্ষ, ব্যঙ্গ- বিদ্রুপবাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় হেসে ফেলেই বলে -

" তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে ।
স্বামী হয়ে, বাপ হয়ে, ভাই হয়ে, ছেলে হয়ে । ওটা নতুন
নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।" [১৪]

লক্ষণীয় 'আমাদের' সর্বনামের প্রয়োগে। সত্যবতী এখানে কেবল নিজের যন্ত্রণাময় জীবনের কথা বলেনি বিশ্বের সর্বকালের সব যুগের সমস্ত লাঞ্ছিত নারীদের অভিশপ্ত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ট্র্যাজিক বেদনার কথা তুলে ধরেছেন। সত্যবতী ও সুর্বণ হয়ে উঠেছে চিরকালের লাঞ্ছিতা অপমানিতা আত্মা। প্রান্তিকায়িত নারী- পরিসরের বোবা যন্ত্রণার প্রতিনিধি ।

' প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বয়ান আপাত সমাপ্তিতে পৌঁছেছে সত্যবতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সুবর্ণকে বিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্তে এবং সেই সূত্রে সত্যবতীর স্বামী-সংসার ত্যাগের ঘটনায়। সত্যবতীর জীবন- ব্যপ্ত সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বিকল্প জীবনের সন্ধান পরবর্তী প্রজন্মে প্রসারিত হতে পারল না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতন্ত্রের প্রতিশোধ স্পৃহায় । শাশুড়ি এলোকেশী ও স্বামী নবকুমার পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের প্রতিহারি হয়ে সত্যবতীর দীর্ঘকালের সাধনা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে । সুবর্ণলতাকে পিতৃতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে প্রমণ করতে চেয়েছে যে মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। নারীসত্তার এই চরম অবমাননার সঙ্গে আপস না করে সত্যবতী মুহূর্ত-মধ্যে বিয়ের আসর ছেড়ে চিরকালের মতো পাড়ি দিয়েছে সম্ভাব্য বৃহত্তর জগতের সন্ধানে। নাট্যকার ইবসেনের ' A Doll's House'(১৮৭৯)[১৫] নাটকের নায়িকা নোরা নারীত্বের অপমান সহ্য করতে না পেরে যেভাবে স্বামী হেল্‌মের সঙ্গে দীর্ঘ আট বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল, ঠিক একই পদ্ধতিতে সত্যবতীও বর ও ঘর ছেড়েছে। আপাত ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে । দীর্ঘ ত্রিশ বছরের দাম্পত্য-সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে । সত্যবতীর অন্তিম উচ্চারণ ও হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সংকেত -গর্ভ, ব্যঞ্জনাময় যে ভাষা বোঝার শক্তি নবকুমারের মতো বৃত্তবন্দী স্থূলবুদ্ধি মানুষের ছিল না-

" সুবর্ণ যদি মানুষ হবার মালমশলা নিয়ে জন্মে থাকে

ঠাকুরঝি, হবে মানুষ ।।... নিজের জোরেই হবে ।
তার মাকে বুঝবে । নইলে ওর বাপের মতন ভাবতে বসবে ,
মা নিষ্ঠুর !সে ভাবনা বন্ধ করি উপায় আমার হাতে নেই !" [১৬]

- সত্যবতী সমস্ত রকম পিছুটান হেলায় উপেক্ষা করে চলেছে 'কাশীতে বাবার কাছে'-" সারাজীবন ধরে অনেক প্রশ্ন জমিয়ে" রেখেছে সে; আজ তারই 'উত্তর চাইতে' রওনা দিয়েছে সত্যবতী । পিতার কাছ থেকে সত্যবতী তার প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরেছিলো কিনা লেখিকা তা আমাদের জানাননি; কিন্তু দীর্ঘকাল পর কাশী থেকে মেয়েকে লেখা একটি চিঠির সূত্রে আমরা জানতে পারি সত্যবতী নিজস্ব পরিসর গড়ে তুলেছে কাশীতে মেয়েদের স্কুল করতে পেরেছে এবং জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে নারীসত্ত্বার সামাজিকীকরণ তার মুক্তির প্রধান সোপান । সুবর্ণের কাছে লেখা সত্যবতী দীর্ঘ চিঠির সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে নারীমুক্তির কথা –

" ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না , ভবিষ্যৎ কালই দিবো ।।... স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনাধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকেই ।।.. আশ হয় এইভাবেই কালের চেহারার পরিবর্তন হইবে ।।... ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ মানুষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে মেয়েমানুষও মানুষ । বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্ম-দক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন । একপক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যেই তাহাদের সৃষ্টি নয়।" [১৭]

এভাবেই সত্যবতী নারী থেকে মানবী হয়ে ওঠার পথ প্রস্তুত করেছে। নিঃসন্দেহ সত্যবতী কালান্তরের পথিক, নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিল বলেই দেশের পরাধীনতা ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা দূর করার কথা সে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছে। শুধু নিজের মেয়ের জন্য নয়, দেশের সহস্র সহস্র সুবর্ণলতার জন্য কেঁদেছে সত্যবতী। দিয়েছে ধৈর্য্যের, সহ্যের, ত্যাগ-তপস্যার পরীক্ষা। সত্যর এই সংগ্রাম বিফল হয়নি প্রজন্ম পরম্পরায় তা বয়ে গেছে। সত্যবতী যে প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখে গেছে তা তার উত্তরসূরি সুবর্ন ও বকুলের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সার্থকমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ আসলে এক ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিকথা। 'আমি নারী মাত্র নই, আমিও মানুষ'- এই মুকগ্য বাতাই সত্যবতী-সুবর্ণলতা বকুলের মতো নানা প্রজেন্মের নারীর কণ্ঠে নানা ভাবে নানা সুরে ঘোষিত করেছে । তাই বলা যায় , আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাস আসলে নারীসত্ত্বা ও নারীর আত্মপ্রতিষ্টার এক ধারাবাহিক ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন। এখানে নারীর কথা তারা নিজেরাই বলেছে বাংলা সাহিত্যে এভাবেই উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন দিগন্ত। 'দিনের আলোর পৃথিবীকে' আশাপূর্ণা দেবী জানিয়ে গেছেন 'অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস'। আর এই মহাভাষ্যের কথকতাতেই তাঁর ট্রিলজির সার্থকতা ।

তথ্যসূত্র

১/ মল্লিকা সেনগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং ,২০১১,
২/ জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন-১, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯১১, পৃ.১৫৪
৩/ শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী (সম্পাদক নাজিবুল ইসলাম মন্ডল)। গিরি প্রিন্ট সার্ভিস, কলকাতা ৭০০০০৯, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ.২২, ২৪
৪/ তদেব, পৃ. ৪২
৫/ তদেব, পৃ. ৪৭
৬/ প্রথম প্রতিশ্রুতি, আশাপূর্ণা দেবী মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ৭০০০৭৩, সপ্তস্ত্রিংশৎ মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪০৪, পৃ .১৩
৭/ তদেব , পৃ .১৩
৮/ তদেব পৃ .২২
৯/ তদেব পৃ .১০৯
১০/ তদেব পৃ .১০৫
১১/তদেব পৃ .১৫২, ১৫৩

১২/ তদেব পৃ .২১৭
১৩/ তদেব পৃ .২১৯
১৪/ তদেব , পৃ .৪৩৪
১৫ / নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে , তপোধীর ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপনি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৭, পৃ .২৫৬
১৬ / সত্যবতী ট্রেলজি, আশাপূর্ণা দেবী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ, পৌষ-১৪২০, পৃ .৩৮৯
১৭ / নারীচেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে , তদেব , পৃ .২৬২ ।

-